যুগান্তর

তারিখ ..04 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৬...

মো. সিদ্দিকুর রহমান

ঝরে পড়া রোধে কিছু পরামর্শ

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সাফল্য প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ। তবে প্রাথমিক শিক্ষায় একটি নেতিবাচক দিক হচ্ছে অস্বাভাবিক হারে ঝরে পড়া। ঝরে পড়া রোধে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সঠিক চিত্র। সঠিক তথ্যপ্রাপ্তির মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া গেলে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া সম্ভব। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ঝরে পড়া নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে যে ইঙ্গিত করেছেন তা মোটেই বাস্তবসম্মত নয়। তিনি বাস্তবতাকে উপলব্ধি না করেই শিক্ষক সমাজকে পুরো জাতির সামনে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন, অনেক স্কুলে নতুন বই ও বিস্কুট পাওয়ার জন্য ভুয়া ভর্তি দেখানো হতে পারে। তবে এ ধরনের কাজ বন্ধের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশের সরকারি-বেসরকারি স্কুল, এনজিও স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনের সব শিশুকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হয়। এটা বর্তমান সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী সাফল্য। ভুয়া ভর্তি দেখিয়ে স্কুলগুলোর বাড়তি বই নিয়ে কী স্বার্থ হাসিল হবে তা বোধগম্য নয়। পুরনো কাগজপত্রের দোকানে বিক্রি করা ছাড়া আর কোনো লাভ আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান নয়। বিষয়টি মাননীয় মন্ত্রী একটু ভাববেন আশা করি।

সারা দেশের ৮২টি উপজেলায় উন্নতমানের বিস্কুট পাওয়ার জন্য তিনি ভুয়া ভর্তি প্রসঙ্গ টেনেছেন। বিস্কুট প্রদানকারী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) কর্তৃপক্ষ বিস্কুট সরবরাহ করে প্রতিনিয়ত শ্রেণীতে উপস্থিতির সংখ্যা দেখে তাদের স্টক মেলায়। এই বিষয়টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ অনেকে দেখভাল করে থাকেন। বিস্কুটটি পুষ্টিসমৃদ্ধ, তাই শিশুর চাহিদা পূরণে সফলতা এসেছে। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে একই বিস্কুট খাওয়ার ওপর শিক্ষার্থীদের বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের তীক্ষ্ণ নজরদারির মধ্যে রেখে জোর করে ক্লাসে বিস্কুট খাওয়াচ্ছেন। আমার ছোট নাতিন আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে, যে স্কুলে জোর করে বিস্কুট খাওয়ায় না সে স্কুলে তাকে ভর্তি করাতে হবে। এই বিস্কুট দোকানে বিক্রির কোনো সুযোগ বা চাহিদা নেই। তাই বিস্কুট পাওয়ার লোভে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি করার যৌক্তিকতা নিয়ে মন্ত্রী মহোদয়কে ভাবতে হবে। মাননীয় মন্ত্রীর সততা, নিষ্ঠা নিয়ে শিক্ষকদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে শুনেছি। অথচ তার আজকের ভাবনা দেখে শিক্ষক সমাজ হতবাক।

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার মূলে রয়েছে নানা কারণ। ২০১৪ সালের ৯ মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা ও প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকদের ২য় শ্রেণীর মর্যাদা ও শিক্ষকদের আপগ্রেড বেতন প্রাপ্তির সিদ্ধান্ত পাল্টানো হয়েছে। নোট-গাইড ও কোচিং বাণিজ্যের রমরমা ব্যবসায়ের প্রসার ঘটছে, শিক্ষকদের হয়রানিমূলক কার্যক্রম বন্ধ হয়নি, শিক্ষক সংকটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে ইতিবাচক কোনো উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। প্রতি বছর বিদ্যালয়ভিত্তিক শিশু জরিপ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিশু জরিপ কার্যকরভাবে সম্পন্ন হলেও শহর এলাকায় জরিপ কাগজে-কলমে সংঘটিত হয়। জরিপ এলাকা বেশির ভাগ এতই বৃহৎ থাকে যে, যেখানে ভোটার তালিকা করতে ৩০০-৪০০ লোক লাগে, সেখানে ১৫-২০ জন প্রাথমিক শিক্ষক দিয়ে এই কাজ করানো হয়, যা তাদের পক্ষে ৪-৫ মাসেও করা সম্ভব নয়। এর অন্যতম কারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বল্পতা। যেখানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই অথচ কিন্ডারগার্টেন অথবা বেসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক শাখা আছে সেই এলাকায় জরিপ হয় না। সাধারণত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা বছরের মাঝে বাসা পরিবর্তন করে অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। যেহেতু আগের বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র নেয়া বাধ্যতামূলক নয়, সেহেতু এই শিশুকে ঝরে পড়ার আওতায় আনা হয়। সমীক্ষার তথ্য যাই হোক না কেন, ঝরে পড়ার ব্যাপকতা না কমলেও অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করাতে আগের তুলনায় বেশ আগ্রহী। অভিভাবকরা দরিদ্র হলেও তাদের সন্তানকে শত কষ্টের বিনিময়েও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করাতে চান। নানা প্রতিবন্ধকতায় সে আলো নিভে যায়। শিক্ষা গ্রহণের যাবতীয় চ্যালেঞ্জ দূর করার মধ্য দিয়েই ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব।

ঝরে পড়া রোধের একটি প্রধান উপায় হচ্ছে শিশুকে আনন্দদায়ক পাঠের মাধ্যমে শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও শিক্ষাকে বিনোদনমূলক করা গেলে তার পক্ষে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা বা লেখাপড়া ছেড়ে দেয়া অসম্ভব হবে। সরকার শিশুশ্রেণীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, উপকরণের মাধ্যমে মোটামুটি পরিবেশ সৃষ্টি করে আসছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের ভাবনায় থাকবে শিশুদের আনন্দদায়ক পাঠদান পরিকল্পনা। অথচ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে তাদের ওপর এমন ক্লাসের চাপ দেয়া হয়, তারা বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী হওয়ার পরিবর্তে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট বিদ্যালয়ের জন্য মরণব্যাধি। সেই সংকটে শিশুদের বিদ্যালয়ের প্রতি ভালোবাসা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। সরকার বা সংশ্লিষ্টদের ভাবনা ছোট শিশুদের পড়াতে এত শিক্ষক লাগবে কেন? ঝরে পড়া রোধে খোদ অর্থমন্ত্রীকে শিক্ষাখাতে বরাদ্দে কৃপণতা ত্যাগ করতে হবে।

দারিদ্র্য ঝরে পড়ার আরেকটি কারণ। বলা হচ্ছে দরিদ্রতা রোধে সরকার এক সন্তানকে ১০০ টাকা, দুই সন্তানকে ১২৫ টাকা দিচ্ছে। দরিদ্রতা দূরীকরণে সরকার ৪০ ভাগ শিশুকে অর্থ দেবে। বর্তমান দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে বিচার করলে এই বরাদ্দ শিশুর অভিভাবকদের দারিদ্র্য বিমোচনের পরিবর্তে উপহাসে পরিণত করছে। প্রকৃত দরিদ্র চিহ্নিত করে কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রদানের বিষয়টি শিগগির বিবেচনায় আনতে হবে। যেসব দরিদ্রের সন্তান নিয়মিত স্কুলে যায়, তাদের বিশেষ কোটায় সাহায্য দেয়া যেতে পারে। দুপুরের খাবার একনাগাড়ে একই বিস্কুট না দিয়ে খাবারের পরিবর্তন এবং টার্গেট এলাকার সম্প্রসারণ জরুরি।

নোট-গাইড, কোচিং সেন্টার সম্প্রসারণের প্রধান কারণ বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ঘাটতি। লেখাপড়ার ঘাটতি কমাতে শিক্ষক সংকট শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে থেকে প্রশ্নপত্র করার নির্দেশনা বাতিল করে পাঠ্যবইকে শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত করতে হবে।

ভর্তির হার কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে হলেও ঝরে পড়ার হার বেশি হওয়ায় ভর্তি সাফল্য ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ঝরে পড়া রোধে সবাইকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষার বাজেটকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করছি।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*